রথে, উল্টোরথে মহাপ্রভু

ভিড়ে-ঠাসা তীর্থযাত্রায় বা ঘরের নিশ্চিত আরামে বসে দূরদর্শনের পর্দায়, যে ভাবেই বাঙালি আজ পুরীর রথ দর্শন করুক, সেই মুহূর্তে তাদের মনে পড়ে শ্রীচৈতন্যের নাম। সন্ন্যাস নেওয়ার অল্প দিন পরে, ১৫১০ সালে পুরীতে প্রথম বার পৌঁছে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর, জড়িয়ে ধরতে গিয়েছেন দারুবিগ্রহ। সফল হননি। তাঁর স্বেদকম্পিত শরীর, আনন্দাশ্রু, রাগানুরাগা ভক্তির আবেশ ও নৃত্য কোনওটারই মর্ম সে দিন বুঝতে পারেননি মন্দিরের কর্মীরা। প্রায় উন্মাদ ভেবে তাঁকে সে দিন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর ভক্তদের অনিশ্চিত সম্পর্কের সেটাই শুরু।

জীবনের ২৪টা বছর শ্রীচৈতন্য কেন পুরীতেই ব্যয় করলেন, তা নিয়ে আজও ইতিহাসবিদদের মধ্যে হরেক মত ও পাল্টা মত। ২৪ বছরের মধ্যে প্রথম ৬ বছর অবশ্য তিনি বৃন্দাবনসহ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত সফরের জন্য পুরীকেই কেন্দ্র করেছিলেন। সেখান থেকেই নানা দিকে যাতায়াত করেছিলেন। মায়ের সঙ্গে শেষ বার দেখা করে আসার পর পুরীতে টানা ১৮ বছর বাস করেছেন, ১৫৩৩ সালে সেখানেই রহস্যজনক ভাবে বৈকুণ্ঠে লীন হয়ে গেলেন।

পাঁচ শতাব্দী পিছনে ফিরে আজ যদি আমরা জানতে চাই, মহাপ্রভু সে দিন রথ, উল্টোরথের উৎসবে কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কতগুলি তথ্য জরুরি। ১১৩৫ সালে রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গা শবর ও স্থানীয় উপজাতিদের কাষ্ঠনির্মিত দেবমূর্তিটিকে ওড়িশার প্রধান দেবতা তথা পুরুষোত্তম হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। ভেদাভেদ দূর করে সবাইকে এক ছাতার নীচে আনার পক্ষে সেটি ছিল চমকপ্রদ এক সামাজিক প্রকল্প। এর আগে ২৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই এলাকাতেই কলিঙ্গ যুদ্ধ, তার কয়েক বছর পরই সম্রাট অশোক চমকপ্রদ সেই সিদ্ধান্ত নিলেন। বেশির ভাগ প্রজা যে অনুশাসন মানে, সেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তাকে দিলেন রাজ-স্বীকৃতি। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আর এক জন প্রায় একই রকম মাস্টারস্ট্রোক খেললেন। রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন তাঁর রাজ্যে নিপীড়িত খ্রিস্টান জনতার ধর্মকে দিলেন স্বীকৃতি। নিম্নবর্ণের প্রজাদের পূজিত দারুব্রহ্মকে স্বীকৃতি দিয়ে অনন্তবর্মন যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তা বোঝা যাবে ওড়িশার প্রতিবেশি রাজ্য, এই বাংলার দিকে চোখ ফেরালেই। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিমদের জয়ের সত্তর বছরের মধ্যে বাংলা প্রায় বিনা যুদ্ধে চলে গেল সুলতানি শাসনে, প্রজারা অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। ওড়িশা প্রায় ৩২ বার মুসলিম হামলায় আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু শাসকেরা সেখানে কোনও দিন হিন্দুসমাজকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হননি। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও নানা কারণে তৎকালীন বাংলার প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন। অথচ, ওই সময়েই ওড়িশায় দুই শতাংশের বেশি হিন্দু ধর্মান্তরিত হলেন না। কারণ, সেখানে নীচুতলা থেকে ওপরতলা অবধি যাবতীয় হিন্দুর উপাস্য এক জনই। পুরুষোত্তম জগন্নাথ স্বয়ং!

অনেক ঐতিহাসিকের মত, মুসলিম শাসনের বাংলা বা বৃন্দাবনের থেকেও এই হিন্দু রাজ্যটিতে শ্রীচৈতন্য অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন, পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব তাঁর শিষ্যত্বও নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ উদ্‌ধৃত করে দেখিয়েছেন, চৈতন্য রাজাকে মুসলিম শাসনাধীন গৌড়বঙ্গ আক্রমণ থেকে বিরত করেছিলেন। যুদ্ধে প্রাণহত্যা ও ক্ষয়ক্ষতি তাঁর অপছন্দ ছিল।

Advertising

Advertising

আবার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘চৈতন্যচরিতামৃত‘-র মধ্যলীলা পর্যায়ে জানিয়েছেন, রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব কী ভাবে নিজে এক বার চৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীদের রথযাত্রায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। জগন্নাথ

মন্দিরের ক্ষমতাবান দ্বৈতাপতিদের সেখানে মদমত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মনোভঙ্গিটি কৃষ্ণদাসে চমৎকার প্রকাশিত। বিশাল দারুমূর্তিগুলি কী ভাবে রেশমি দড়িতে বেঁধে দ্বৈতারা মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসছেন, পুরু মাদুরের উপর দিয়ে সেগুলি রথে নিয়ে তুলছেন, সেই বর্ণনাও চরিতামৃতে আছে। রাজা যে ভাবে সোনার হাতলওয়ালা ঝাঁটা নিয়ে জগন্নাথদেবের পথ পরিষ্কার করেন, সারা রাস্তায় সুগন্ধি চন্দনজল ছেটানো দেখে মহাপ্রভুও চমৎকৃত হয়েছিলেন।

চরিতামৃত আরও জানিয়েছে, সোনায় মোড়া তিনটি রথ সুমেরু পর্বতের চেয়েও উঁচু। রথ এগোয়, প্রচুর পিতলের ঘণ্টা বাজতে থাকে। রঙিন রেশমি কাপড় ও কাচের ঝলকানিতে সমবেত দর্শনার্থীদের চোখ ধাঁধিয়ে য়ায়। বৈষ্ণব সাধু ও কীর্তনীয়ারা পথে যমুনাপুলিনের মতো সাদা বালি ছড়িয়ে দেন। সম্ভবত, মধ্যযুগে বর্ষার কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল পথে বিশাল রথ টানা সুবিধের ব্যাপার ছিল না বলেই এই বালুকাসিঞ্চন। বালির আরও একটা কাজ ছিল। রথ টানতে গিয়ে বর্ষার রাস্তায় লোকে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেত না।

শ্রীচৈতন্য কী ভাবে তাঁর ভক্তদের এই রথযাত্রায় একত্র করে নিজেকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করতেন, তার বর্ণনাও দিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণদাস। অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ এই দৃশ্যে প্রথম থেকেই ভাবোন্মাদ হয়ে যেতেন, কিন্তু মহাপ্রভু নিজে স্বরূপ দামোদর আর শ্রীবৎস ঠাকুরের সংকীর্তন দলের দিকে হেঁটে পৌঁছে যেতেন। তাঁদেরকেও মালা, চন্দনে সাজিয়ে দিতেন। প্রতিটি সঙ্কীর্তন দলকে মহাপ্রভু নিজে পরিদর্শন করতেন, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাসরা কে কী ভাবে নাচে নেতৃত্ব দেবেন সিদ্ধান্ত নিতেন। সঙ্কীর্তন আর নামগানে কী ভাবে দলনেতার সঙ্গে সুর মেলাতে হবে, সেটিও বলে দিতেন। ডিটেইলের প্রতি এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টি বুঝিয়ে দেয়, চৈতন্যের মতো নেতা সব বিষয়ে সজাগ। তাঁর ম্যানেজমেন্ট স্টাইল, পরিকল্পনা সবই রথ, উল্টোরথের দিনগুলিতে প্রকট। সঙ্কীর্তনে যোগ দিতে কুলীনগ্রাম থেকে এক দল ভক্ত এসেছেন, চৈতন্য রামানন্দ এবং সত্যরাজকে তাঁদের নেতৃত্ব গিতে বললেন, যাতে কোথাও তাল কেটে না যায়। শ্রীখন্ড থেকে আর একটি দল এল, নরহরি ও রঘুনাথের দায়িত্বে তাঁদের সঁপে দেওযা হল। শ্রীক্ষেত্র তখন চৈতন্যের প্রতি ভয়ে-ভক্তিতে আপ্লুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ছোট্ট দলটি রথযাত্রার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হাজির। জগন্নাথের রথের সামনে

অদ্বৈত আচার্য ‘হরি বোল’ ধ্বনিতে মাতিয়ে দেন, শ্রীচৈতন্য নৃত্যের আবেশে লাফিয়ে ওঠেন। এক বার সে রকম করতে গিয়ে পড়েও গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে গড়িয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে ফের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। মহাপ্রভুর সাফল্যের কারণ তাই শুধু রাগানুরাগা ভক্তি, অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণপ্রেমে খুঁজলে হবে না। নেতৃত্বদানের খুঁটিনাটিও দেখতে হবে।

রথের শহরে, জগন্নাথ-কাহিনিতে শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে বড় অবদান কী? চৈতন্য বারংবার বলেছেন, পুরীর এই নীলমাধবই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তাঁরই আরাধনা করেন। চৈতন্য পুরীতে বলেন, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ভক্ত, কোনও জাত বা সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী নন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ‘চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে’ দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে মহাপ্রভুর এই পুরীদর্শন। সেই দর্শনের সঙ্গে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ মেটিফ মিলেমিশে ওড়িশার পরিচিত জগন্নাথ-পুরুষোত্তম-ত্রৈলোক্যমোহন বিগ্রহের ভাবমূর্তিতে এল অন্য মাত্রা।

এই ভাবমূর্তিটি নিয়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দড়ি টানাটানি ছিল। চৈতন্য অন্যদের হারিয়ে জিতে গেলেন, কারণ তিনি পুরীতে থেকেই কাজগুলি করেছিলেন। ষোড়শ শতকের গোড়াতেও পুরীতে শৈব ও শাক্তরা বৈষ্ণবদের যথেষ্ট বেগ দিত, প্রতাপ রুদ্রদেবের মতো রাজাকে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হত।

আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। পুরীবাসে চৈতন্যের প্রধান শিষ্যরা, যেমন রামানন্দ, শ্যামানন্দ, বলদেব বিদ্যাভূষণ কেউই ব্রাহ্মণ নন। পুরীর তৎকালীন ব্রাহ্মণ পান্ডা ও পুরোহিতেরা সারা বছর এই শূদ্রদের জগন্নাথ দর্শনের বিপক্ষে। শবরদের জগন্নাথ তখন ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্যে। মন্দিরের পুরোহিতেরা বিধান দিলেন, জগন্নাথদেব বছরে এক বারই মানুষের দরবারে বেরোতে পারবেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের সব জারিজুরি একটা জায়গায় হার মানতে বাধ্য হল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যদের নগর সঙ্কীর্তন। গাঁধীজির সত্যাগ্রহ যেমন বহু পরে আপামর জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করেছিল, জগন্নাথধামে শ্রীচৈতন্যের কীর্তিও সে রকম। পুরীতে এই পদক্ষেপগুলি নিয়েই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গৌড়বঙ্গের ছোট্ট মানচিত্র ছাপিয়ে গেল, সারা দেশে হয়ে উঠল স্বীকৃত এক ধর্মদর্শন।

রহস্যজনক ভাবে পুরী থেকে তিনি হারিয়ে গেলেন। অচ্যুতানন্দ দাস, দিনকর দাস, ঈশ্বরদাসের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ টীকাকারেরা বারংবার বলেছেন, নীলমাধব বিগ্রহে মিশে গিয়েছে তাঁর শরীর, কিন্তু সে নিয়ে হরেক সন্দেহ আর বিতর্ক। মনে রাখতে হবে, মহাপ্রভু, সুভাষচন্দ্রের মতো নেতার রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে অযথা তর্কাতর্কি শুধুই উত্তাপ ছড়ায়, প্রজ্ঞার আলো কিছু থাকে না।